# ডাকসু নির্বাচন: শিক্ষক পরিদর্শকদের প্রতিবেদন ও প্রতিক্রিয়া

গত ১১ই মার্চ, ২৮ বছর পর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারী সংগঠনের সন্দেহজনক তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আটজন শিক্ষক নিজ দায়িত্বে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন ও তার ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এর কারণে ক্ষিপত অনিয়মে যুক্ত প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট মহল থেকে প্রচার শুরু হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয় নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষক এই বিষয়ে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। এখানে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ও তার ওপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া একসাথে প্রকাশ করা হল।

**ডাকসু নির্বাচন সর্বাঙ্গীণ সুষ্ঠু হয় নি : পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা**

আজ ১১ই মার্চ বহুল প্রতীক্ষিত ঐতিহাসিক ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে এই নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আমাদের সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যেও ব্যাপক আগ্রহের সঞ্চার হয়। আমরা কয়েকজন শিক্ষক নিজস্ব উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবামূলক পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চিফ রিটার্নিং অফিসার মৌখিকভাবে অনুমতি দেন এই বলে যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে এই দায়িত্ব চাইলেই পালন করতে পারবো। আমরা সকাল নয়টা থেকে বিকেল দুইটা পর্যন্ত ছাত্রদের হল এসএম হল, সূর্যসেন হল, মহসিন হল, এফ রহমান হল, শহীদুলাহ্ হল এবং ছাত্রীদের হল রোকেয়া হল এবং কুয়েত মৈত্রী হল পরিদর্শন করি।

আমরা কুয়েত মৈত্রী হল থেকে আমাদের পর্যবেক্ষণ শুরু করি কারণ, আমরা শুরুতেই জানতে পারি এই হলে ভোটদানে অনিয়মের কথা। আমরা জানতে পারি, ভোট গ্রহণ শুরু হবার আগে ছাত্রীরা নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা শিক্ষিকাদের কাছে ভোটদানের পূর্বে শূন্য ব্যালট বাক্স দেখতে চান কিন্তু তাদের এই ন্যায্য দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। এতে ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং এক পর্যায়ে কেন্দ্রের পাশের কক্ষ থেকে একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের পক্ষে পূরণ করা প্রচুর ব্যালটপেপার উদ্ধার করে। সেগুলোর বেশ কিছু আমরা শিক্ষকরাও দেখতে পেয়েছি। এরকম অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে ভোট গ্রহণ স্থগিত হয়ে যায়। এই ঘটনায় প্রভোস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ না হলেও আমরা রিটার্নিং অফিসারদের লজ্জিত ও মর্মাহত দেখতে পাই।

এক পর্যায়ে রোকেয়া হলে গোলযোগের খবর পাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারি, সকালের কুয়েত মৈত্রী হলের অভিজ্ঞতার পর, সরকারি ছাত্রসংগঠনের বাইরের নানান প্যানেলের শিক্ষার্থীরা ভোটকেন্দ্রের পাশের রুমে ব্যালট পেপারের সন্ধান পান এবং সেগুলোকে দেখানোর জন্য কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেন। কিন্তু সেগুলো ছিল সাদা ব্যালট পেপার। এরপর পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং সরকারি ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিরোধীদের ওপর চড়াও হয়। বিরোধীপক্ষের কয়েকজন আহত হন। উভয় পক্ষের উত্তেজনায় এরকম অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে রোকেয়া হলে, যারা নিন্দা জানাই আমরা।

ছাত্রদের হলের ভেতরে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। তবে ভোটকেন্দ্রের বাইরে কতকগুলো অনিয়ম চোখে পড়ে– ক. ভোটারের আইডি চেক করার ক্ষেত্রে ছাত্রলীগের সদস্যরাই বেশিমাত্রায় ভূমিকা রেখেছেন এবং অনাবাসিক ছাত্রদের ভোট দিতে বাধাপ্রদান ও নিরুৎসাহিত করেন তারা খ. ছাত্রলীগের কর্মীরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করলেও, অন্য প্যানেলের প্রার্থী ও কর্মীরা ভোটকেন্দ্রের বাইরে বা ভোটারের সারির আশেপাশে অবস্থানগ্রহণ করতে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন গ. ভোটকেন্দ্রের অব্যবহিত বাইরে কৃত্রিম জটলা করে রেখেছেন ছাত্রলীগের কর্মীরা যাতে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া স্থগিত হয় এবং বাকিরা ভোটদানে নিরুৎসাহিত হয় ঘ. অনেকক্ষেত্রে বুথের ভেতরে আমরা সময় গণনা করে দেখেছি ৫ থেকে ২৩ মিনিট পর্যন্ত সময় ব্যয় করেছে কোনো কোনো ভোটার যা ইচ্ছাকৃত মনে হবার কারণ রয়েছে খ. ভোট চলাকালেই রোকেয়া হলের সামনে একটি সংগঠনের ২০/২৫ জন কর্মীকে বাইকের হর্ন বাজিয়ে শোডাউন করতে দেখা গেছে যা আচরণবিধির লঙ্ঘন।

একটি বড় অসঙ্গতি মনে হয়েছে, ব্যালট পেপারে কোন সিরিয়াল নাম্বার ছিল না। ৪৩ হাজার ভোটারের একটি নির্বাচনের ব্যালটপেপারে সিরিয়াল নাম্বার না থাকাটা আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। কারণ এতে নির্বাচনের ফলাফলে গুরুতর অনিয়ম ঘটানো অনেক সহজ হয়ে যায়। কোন হলে কোন সিরিয়াল গেল, তাও ট্র্যাক রাখার উপায় থাকার কথা না।

পরিশেষে আমরা এটাই বলতে চাই এই বহুল প্রতীক্ষিত ডাকসু নির্বাচনের অনিয়মের ঘটনাগুলো আমাদের খুবই লজ্জিত করেছে। এই ঘটনা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভাবমূর্তিকে চরমভাবে বিনষ্ট করেছে। এতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে যা সার্বিকভাবে অ্যাকাডেমিক পরিবেশ বিঘ্নিত করবে। এত বছর পরে অনুষ্ঠিত এই ডাকসু নির্বাচন সফলভাবে না করতে পারার ব্যর্থতার দায়ভার প্রশাসন থেকে শুরু করে সাধারণ শিক্ষক সবার এবং এই ব্যর্থতা সমগ্র শিক্ষক সম্প্রদায়ের নৈতিকতার মানদণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। আমরা চাই এই ব্যর্থতার একটি সুষ্ঠু তদন্ত হোক এবং দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনা হোক। সেই সাথে এই নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে অবিলম্বে নতুন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হউক।

**পর্যবেক্ষণে উপস্থিত থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ :**

১। গীতি আরা নাসরীন, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
২। কামরুল হাসান, অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
৩। ফাহমিদুল হক, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
৪। মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
৫। রুশাদ ফরিদী, সহকারি অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
৬। কাজী মারুফুল ইসলাম, অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ
৭। তাহমিনা খানম, সহকারি অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৮। অতনু রব্বানী, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

**'পর্যবেক্ষক'দের নিয়ে প্রচারণা : শিক্ষকদের বক্তব্য**

আমাদের 'পর্যবেক্ষক'-এর ভূমিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। সেই প্রতিক্রিয়া টেলিভিশন টক-শোতে গিয়ে ঠেকেছে। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন যারা পরিচালনা করছেন, তারা এই উটকো 'পর্যবেক্ষক'দের ওপর নাখোশ হয়েছেন। সব দেখেশুনে এমনই মনে হচ্ছে।

২৮ বছর পর ডাকসু নির্বাচন, আমরা কোনো ভূমিকা রাখবো না? কিন্তু আমাদের তো কোনো ভূমিকা রাখতে ডাকা হয়নি। কোনো কেন্দ্রে কোনো দায়িত্ব দেয়া হয়নি। তাই আমরা ভাবলাম স্বেচ্ছাসেবামূলক পর্যবেক্ষণ করি। কিন্তু মিডিয়া যেমন কাজের সুবিধার্থে ফ্রেমিং করতে পছন্দ করে, আমাদের 'পর্যবেক্ষক দল' হিসেবে ডেকেছেন তারা। জাতীয় নির্বাচনে যেমন 'পর্যবেক্ষক' থাকেন, দেশি-বিদেশি, আমরাও যেন সেরকম রেজিস্টার্ড কেউ, এরকম কারো কারো মনে হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলছি :

১। আমরা কোনো রেজিস্টার্ড 'পর্যবেক্ষক' ছিলাম না, আমরা কোথাও সেটা দাবিও করিনি। আমরা নিজেদের 'নিজস্ব উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবামূলক

পর্যবেক্ষক' হিসেবে বর্ণনা করেছি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে। বিষয়টি পরিষ্কার থাকা দরকার। এটা ঠিক আমরা এমনি এমনি কাজটি করতে চাইনি, প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার বরাবর আবেদন করেছি। তিনি আমাদের বলেছেন, এরকম কোনো প্রভিশন নেই। তবে শিক্ষক হিসেবে তো আপনারা কেন্দ্র ভিজিট করতেই পারেন। আমরা তাই করেছি, এবং অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছি। এটাকে অফিশয়াল ধরার কোনো কারণ নেই। আমরা ১০ জন আবেদন করি, ৮ জন পর্যবেক্ষণের কাজটি করি। আমাদের কি এই অধিকার ছিল? হ্যাঁ ভাই, ছিল। শিক্ষকের চেতনা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে চলতে চলতে আমাদের কিছু কমন সেন্স গ্রো করেছে। সেই সেন্স বলেছে আমরা এটা করতে পারি। তিয়াত্তরের আদেশ আমাদের অনেক অনেক অধিকার দিয়েছে। সেগুলোর আলোকে কেউ বলুক যে আমাদের এই অধিকার ছিল না।

২। আমরা বলেছি নির্বাচন সর্বাঙ্গীণ সুষ্ঠু হয়নি। মিডিয়াতেও সেরকমই এসেছে। ১২ মার্চ প্রথম আলোর শিরোনাম ছিল 'উৎসাহের ভোট অনিয়মে শেষ'। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লিখেছেন 'আমি খুবই হতাশ হয়েছি'। উপাচার্য মহোদয় বলেছেন 'আমি খুব আনন্দিত', কিন্তু প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেছেন , 'আমি বিব্রত'। ইত্তেফাক–এর প্রধান শিরোনাম ছিল, 'অনিয়ম, বর্জনে ডাকসু'। এখন বলা হচ্ছে, অনিয়মটি কোথায় হয়েছে, দেখাও।

৩। কুয়েত-মৈত্রীর বাইরে আমরা যে অনিয়মগুলো পেয়েছিলাম এবং বিবৃতিতে উল্লেখ করেছিলাম :

"ছাত্রদের হলের ভেতরে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। তবে ভোটকেন্দ্রের বাইরে কতকগুলো অনিয়ম চোখে পড়ে ক. ভোটারের আইডি চেক করার ক্ষেত্রে ছাত্রলীগের সদস্যরাই বেশিমাত্রায় ভূমিকা রেখেছেন এবং অনাবাসিক ছাত্রদের ভোট দিতে বাধাপ্রদান ও নিরুৎসাহিত করেন তারা খ. ছাত্রলীগের কর্মীরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করলেও, অন্য প্যানেলের প্রার্থী ও কর্মীরা ভোটকেন্দ্রের বাইরে বা ভোটারের সারির আশেপাশে অবস্থানগ্রহণ করতে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন গ. ভোটকেন্দ্রের অব্যবহিত বাইরে কৃত্রিম জটলা করে রেখেছেন ছাত্রলীগের কর্মীরা যাতে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া স্থগিত হয় এবং বাকিরা ভোটদানে নিরুৎসাহিত হয় ঘ. অনেকক্ষেত্রে বুথের ভেতরে আমরা সময় গণনা করে দেখেছি ৫ থেকে ২৩ মিনিট পর্যন্ত সময় ব্যয় করেছে কোনো কোনো ভোটার যা ইচ্ছাকৃত মনে হবার কারণ রয়েছে ঘ. ভোট চলাকালেই রোকেয়া হলের সামনে একটি সংগঠনের ২০/২৫ জন কর্মীকে বাইকের হর্ন বাজিয়ে শোডাউন করতে দেখা গেছে যা আচরণবিধির লঙ্ঘন।"

এছাড়া আমরা ব্যালটপেপারের সিরিয়াল নম্বর না থাকার কথা উল্লেখ করেছিলাম। অর্থাৎ নির্বাচন কর্মকর্তাদের হাতে একটা 'মুড়ি' থাকার দরকার ছিল, ব্যালটপেপার ট্র্যাক করার জন্য।

এখন দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ বলুন, এই ব্যাপারগুলো ঘটে নি!

৪। শিক্ষকদের ভূমিকা : কুয়েত-মৈত্রী হলের প্রভোস্ট একদিকে ভোট কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটিয়েছেন, যেজন্য তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে, তেমনি ওই একই হলের হাউস টিউটরদের কাউকে কাউকে লজ্জায় কাঁদতে দেখেছি। তারা আমাদের বলেছেন, এখন ছাত্রীদের সামনে দাঁড়াবো কী করে! সাধারণ শিক্ষকদের বেশিরভাগই নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন সততার সাথে, কিন্তু ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কেউ কেউ অন্যায় করেন। ফলে একজন বা কয়েকজনের জন্য পুরো শিক্ষক সমাজকে দোষারোপ করা যাবে না। তবে একটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু জানা দরকার, প্রভোস্ট মহোদয়কে ভোট কারচুপি করার উৎসাহ ও সাহস কে দিল? তিনি নিজ উদ্যোগে এসব করেছেন? ছাত্রীদের কারণে জিনিসটা ধরা পড়েছে, তিনি বরখাস্ত হয়েছেন। তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। তদন্ত কমিটি কি এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর বের করে দিতে পারবে?

৫। যারা নির্বাচন পরিচালনা করেছেন, তারা ভাবতেই পারেন, সব সুষ্ঠু হয়েছে। আমরা যারা স্বেচ্ছায় এতগুলো কেন্দ্র ঘুরে কিছু কথা বললাম, তা আপনাদের সঙ্গে মিললো না। তাতে কী ক্ষতি হলো? থাক না কিছু ভিন্নমত। গণতন্ত্রে ভিন্নমতের পরিসর আছে তো! নাকি নেই?

১২ মার্চ, ২০১৯

**বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষকের বিবৃতি**

দীর্ঘ প্রায় ২৮ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও হল সংসদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১১ মার্চ ২০১৯। এই নির্বাচন আদায় করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনশন এবং আন্দোলন পর্যন্ত করতে হয়েছে। তাই এই নির্বাচন ঘিরে শিক্ষার্থী শুধু নয়, শিক্ষকদের মধ্যেও ব্যাপক উদ্দীপনা ও আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন বলে গণমাধ্যম মারফত আমরা জানতে পারি। তাঁদেরই আটজন শিক্ষক নির্বাচনের দিন সকাল থেকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের কষ্টকর দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিয়েছেন এবং নির্বাচনে তাঁরা যা দেখেছেন, তার এক নির্মোহ বর্ণনা বিবৃতি আকারে জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের অভিনন্দন জানাই প্রতিকূলতার মধ্যেও সততা নিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য।

গণমাধ্যম থেকে জানতে পারি, ১১ মার্চ সকালে ভোট গ্রহণ শুরুর আগেই বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের ভেতরে একটি প্যানেলের পক্ষে সিল মারা ব্যালট পেপার বস্তার ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়। তারপর রোকেয়া হলে এক ঘণ্টা পর ভোট শুরু করা হয় এবং সুফিয়া কামাল হলে নারী শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে তাঁদের প্রতিনিধিকে কেন্দ্র পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেওয়া হয়। সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) মৈত্রী হলের ঘটনা উল্লেখ করে গণমাধ্যমকে জানান, 'এ দায় আমাদের নিতে হবে।' তার মানে নির্বাচনে অনিয়মের কথা নির্বাচনের দিনই প্রশাসনও মেনে নিয়েছে। আর নির্বাচনের দিন ছাত্রদের হলের বুথ জ্যামিং করে, ভোটকেন্দ্রের বাইরে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা যে জারি ছিল, তার প্রমাণ গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। নির্বাচনের পরদিন থেকে অনশনে বসা ছয়-সাতজন শিক্ষার্থীর অনশন ভাঙাতে গিয়ে সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে নির্বাচনটি সর্বাঙ্গীণ সুষ্ঠু হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের সঙ্গে তুলনা করলে এসব অনিয়ম ও অনিয়মের চেষ্টা প্রায় শতবর্ষী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে, শিক্ষক হিসেবে নৈতিকতার যে উচ্চাসনে বসে আমরা ক্লাসে পাঠদান করি, সেই নৈতিকতার উচ্চাসন ভেঙে পড়েছে। মৈত্রী হলের ঘটনা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটা স্পষ্টতই শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্কের বিশ্বাসযোগ্যতার মূল বাঁধনটিকে ছিঁড়ে ফেলেছে। এটা এখন আর কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একার নয়, বরং সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার্থীদের আস্থার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে।

একদিকে এসব অনিয়ম, শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ আর পাহারায় নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে নির্বাচন শেষ হয়, যাকে প্রশাসন 'সুষ্ঠু' বলে দায় সেরেছে, অন্যদিকে নির্বাচনের দিন ছাত্রলীগ ছাড়া অন্য সব প্যানেল নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে পুনর্নির্বাচন চেয়েছে। নির্বাচনের পরদিন ছাত্রলীগও নির্বাচনকে 'প্রহসনের নির্বাচন' বলেছে। পরে অবশ্য তারা তাদের এই অবস্থান পাল্টেছে। অথচ আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, ১৮ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট কমিটির সভা শেষে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, স্বেচ্ছাসেবী পর্যবেক্ষক দল নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক 'অননুমোদিতভাবে' বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে গিয়ে সামাজিক যোগাযোগ ও প্রচারমাধ্যমে নির্বাচন সম্পর্কে যেভাবে 'অসত্য তথ্য' ও 'বিভ্রান্তি ছড়িয়ে' বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন' করেছেন, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও নিন্দনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপরাধে এই আট শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপাচার্যের কাছে

দাবি করেন তাঁরা। গণমাধ্যমে এ সংবাদ পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমরা মর্মাহত। এ বিষয়ে আমরা নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করা জরুরি মনে করছি :

প্রথমত, ১৯৭৩-এর আদেশের বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো শিক্ষকের প্রক্টরিয়াল ক্ষমতা আছে এবং তা তিনি প্রয়োগ করার অধিকার রাখেন। কাজেই আট শিক্ষকের পর্যবেক্ষণের অধিকার আছে এবং জনগণকে তা জানানোর অধিকারও আছে। এ ছাড়া চিফ রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে তাঁরা পর্যবেক্ষণের মৌখিক অনুমতিও পেয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা অননুমোদিত কোনো কাজ করেননি।

দ্বিতীয়ত, যাঁরা ভোট চুরি করলেন এবং চুরি করতে সাহায্য করলেন, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও শিক্ষকদের ভাবমূর্তির যে ক্ষতি করলেন, তা ৫০ বছর পরও জাতি মনে রাখবে। কাজেই আট শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করে ভাবমূর্তি নষ্ট করেননি, ভাবমূর্তি আগেই নষ্ট হয়েছিল। অনিয়মের কথা গণমাধ্যমে জানিয়ে তাঁরা বরং ক্ষতিপূরণে প্রশাসনের পক্ষেই কাজ করেছিলেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণ আমলে নিলে পরবর্তী সময়ে প্রশাসনেরই লাভ হতো, সম্মান কিছুটা ফিরত।

তৃতীয়ত, অনিয়ম যাঁরা করলেন ও প্রশ্রয় দিলেন, সেই শিক্ষকদের ব্যাপারে কী প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সে ব্যাপারে একটি বাক্যও লেখা হয়নি বিজ্ঞপ্তিতে। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলো, সে ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে যাঁরা অনিয়ম প্রত্যক্ষ করেছেন, সত্যানুসন্ধানের শেষে সেই সত্যকে মানুষের কাছে নিয়ে এসেছেন, তাঁদের শাস্তির দাবি করল প্রভোস্ট কমিটি। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার জন্য এই আট শিক্ষক তথা নিজেদের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে এ রকম দাবি তোলার মধ্য দিয়ে প্রভোস্ট কমিটি তাদের ব্যক্তিস্বার্থ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেন্দ্রিক দলীয় আনুগত্যকে আরও নগ্নভাবে প্রকাশ করল। এই প্রভোস্টদেরই অনেকে নির্বাচনের দিন তাঁদের হলে হলে অনিয়ম বন্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এটা স্পষ্ট যে এ কারণেই যাঁরা এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁরা ব্যবস্থা নিতে চান! এতে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে অনিয়মের বিষয়টা জনপরিসরে আরও স্পষ্ট হয়েছে। আমরা মনে করি, এটা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক এবং এর বিরুদ্ধে নিন্দা জানাই। ক্ষমতার দম্ভ থেকে করা এহেন আচরণ, ক্ষমতাসীন শিক্ষকদের কেবল পরাজিতই করে।

চতুর্থত, আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এমনকি প্রভোস্টরা এও দাবি করলেন যে তাঁদের কাছে কোনো শিক্ষার্থী ভোট দিতে না পারা নিয়ে কোনো অভিযোগ করেননি। অথচ গণমাধ্যমে আমরা দেখেছি যে নির্বাচনের দিনই চিফ রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঁচটি প্যানেলের শিক্ষার্থীরা লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন। এমনকি ১৮ মার্চ সহ-উপাচার্যের কাছে অভিযোগ দিয়েছেন কয়েকজন শিক্ষার্থী। অথচ একই দিনে অনুষ্ঠিত প্রভোস্টদের সভায় দাবি করা হলো, কেউ কোনো অভিযোগ দেননি!

স্বতঃপ্রণোদিত স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করতে যাওয়া শিক্ষকদের শাস্তি দাবি করে এই প্রভোস্টরা নিজেদের নৈতিক দেউলিয়াপনা ও ভিন্নমতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মানতে হবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্নমত সব সময়ই ছিল ও থাকবে এবং এটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্য। ভিন্নমতের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে যে হুমকি দিয়েছেন, তার জন্য তাঁদের ধিক্কার জানাই। অবিলম্বে প্রশাসন এই আটজন শিক্ষকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করবে, সেই দাবি জানাচ্ছি। তা না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নৈতিক পরাজয়ের জের বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও বহু বছর টানতে হবে।

--- নেহাল করিম, অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; তাসনীম সিরাজ মাহবুব, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মাইদুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; সামিনা লুৎফা, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; নাসির উদ্দিন আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়; মানস চৌধুরী, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; আর রাজী, সহকারী অধ্যাপক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; সায়মা আলম, সহকারী অধ্যাপক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; কাজী মামুন হায়দার, সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; কাজলী সেহরীন ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মুনাসির কামাল, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শামসুল আরেফিন, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; সুবর্ণা মজুমদার, সহকারী অধ্যাপক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; মির্জা তাসলিমা সুলতানা, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; সাঈদ ফেরদৌস, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাদাফ নূর, সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; মাসুদ ইমরান মান্নু, সহযোগী অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, নাসরিন খন্দকার, সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; খাদিজা মিতু, সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাভেদ কায়সার, সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাবিপ্রবি; রায়হান শরীফ, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; সৌম্য সরকার, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াকিলুর রহমান, অধ্যাপক, গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নাফীসা তানযীম, সহকারী অধ্যাপক, গ্লোবাল স্টাডিজ, উইমেন্স, জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি বিভাগ, লেসলি বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র; কাজী শেখ ফরিদ, সহযোগী অধ্যাপক, গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; মাহমুদুল সুমন, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; হিয়া ইসলাম, প্রভাষক, মিডিয়া স্টাডিজ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, বাংলাদেশ (ইউল্যাব); আলী রীয়াজ, ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র; আকমল হোসেন, সাবেক অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খন্দকার হালিমা আক্তার রিবন, সহযোগী অধ্যাপক, নাট্য ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পারভীন জলী, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মাহমুদ হোসেইন, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, সান ফ্রান্সিসকো স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র; লুৎফুন হোসেন, সাবেক শিক্ষক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; দীপ্তি দত্ত, প্রভাষক, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; অভিনু কিবরিয়া ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, অণুজীববিজ্ঞান বিভাগ, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; অর্পিতা শামস মিজান, প্রভাষক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; আইনুন নাহার, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; মোশরেকা অদিতি হক, সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; মোশাহিদা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; রায়হান রাইন, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক সুমন সাজ্জাদ, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; রোবায়েত ফেরদৌস, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. তৈয়েবুর রহমান, অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. আবদুর রাজ্জাক খান, সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সিউতি সবুর, সহযোগী অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়; গোলাম হোসেন হাবীব, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; হিমেল বরকত, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; স্বাধীন সেন, অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; কাবেরী গায়েন, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।